জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প

শ্রাবণী পাল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একসময় জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, ''অনেকের কাছেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কলকাতায় বসবাসের সূত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীহয়তো 'অনেকের কাছেই অ-দেখা' নন, কিন্তু প্রচার বিমুখ অন্তর্মনা উদাসীন পাঠক - সমাদর বঞ্চিত এই মানুষটি অনেকের কাছেই 'অনুপস্থিত' বটে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হলেও তাঁর প্রাপ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাননি। বাংলা ছোটগল্পের আলোচনায় প্রায়শ 'অনুপস্থিত' এই লেখক তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে যখন অন্তর্ভুক্ত হন 'বিস্মৃত প্রায়' গল্পকারদের তালিকায়, তখন জ্যোতিরিন্দ্রের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য অথবা সীমাবদ্ধতা কোথায় তার সন্ধান বাংলা গল্পের নিতান্ত সাধারণ একজন পাঠক হিসেবেই একটা কৃত্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯১২ সালের ২০ আগস্ট বাংলাদেশের কুমিল্লার মাতামহের সরকারি আবাসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম। তাঁর মাতামহ ছিলেন কুমিল্লার পোস্টমাস্টার। জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি চলে আসেন কুমিল্লার মহকুমা শহরে তাঁর পিতার কর্মস্থল ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়। জ্যোতিরিন্দ্রের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণবেড়িয়া হাইস্কুলের শিক্ষক, পরে ওকালতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মাইনর স্কুলে জ্যোতিরিন্দ্রের শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত। আশৈশব স্বল্পবাক্ আত্মমগ্ন ভাবুক প্রকৃতির এই বালকের জীবন কেটেছে আকাশ - প্রান্তর - ফুল - পাখি দেখায় মুগ্ধতায়,—

> ''একুট বড় হয়ে দেখলাম, চমৎকার ওই মফস্বল শহর। তখন একটু একটু দেখতে শিখেছি—একটু একটু বুঝতে শিখেছি। কোর্টকাচারি, হাসপাতাল, বাজারের পরিবেশে আমাদের বাসা ছিল। ওর গণ্ডি পার হলে একদিকে শান্ত-স্নিগ্ধ তিতাস নদী, অন্যদিকে ধানক্ষেত, পাট ক্ষেত এবং এই ছোট্ট শহরটা ঘিরে অফুরন্ত সবুজের সমারোহ, এসব দেখতে খুব ভালো লাগতো। পুকুরঘাট, ডালপালা ছড়ানো ঝুপশি মতো শ্যাওড়াগাছ, লাল ফড়িংয়ের ওড়াউড়ি, তিতাসের বুকে নৌকাদৌড় প্রতিযোগিতা, দুর্গা প্রতিমার ভাসান। মৌরলা খলসের আঁশটে গন্ধ, ভোরের বাতাস—এসব নিয়েই আমার ছোটবেলা।''

আর আবিষ্ট করেছিল

'আশ্বিনের কোনও নির্জন ঊষায় হেলিডি সাহেবের বাগানের দুটি শিশির ভেজা গোলাপ।'' এইভাবেই রূপসী বাংলার মুখ খুব কাছে থেকে দেখতে দেখতে তাঁর বেড়ে ওঠা। কৈশোর থেকেই তাঁর লেখালেখির সূচনা, একসময় ছবি আঁকাতেও তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। ১৯৩৫ সালে বি. এ পাশ করেন ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে, ১৯৩৭-৩৮ সাল নাগাদ চলে আসেন নগর কলকাতায়, কাজের সন্ধানে। —চলমান শহর, নানারকম শব্দ, নানারকম মানুষ—আরেকভাবে জ্যোতিরিন্দ্রকে তৈরি করে চলতে থাকে।

> ''চাকরি-বাকরি যত না খুঁজছি, সাহিত্যের কাগজ, সাহিত্যের পত্রিকা—বিরাট এই কলকাতা মহানগরীতে কোথায় কি ছড়িয়ে আছে খুঁজে খুঁজে দেখছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি। হোটেল -মেসের জীবন—সারাদিন আমাকে কেবল গল্পের ভাবনায় পেয়ে থাকতো। আর হঠাৎ চাকরি দেবে কে? শুধু গ্রাজুয়েট। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোও আমার ধাতে নেই। তবে ফাঁকে ফাঁকে চাকরি যে না করেছি তা নয়। বেঙ্গল ইমিউনিটি (ওষুধের দোকান), যুগান্তর, আজাদ পত্রিকা, টাটা এয়ারক্রাফট ইত্যাদিতে কিছুদিন করে চাকরি করেছি।''

পারুল দেবির সঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবন কেটেছে প্রথমদিকে বেলেঘাটার বস্তি এলাকায়, কখনো বাগমারিতে, আর পরে পিকনিক গার্ডেনে সরকারি আবাসনে। ছাত্রাবস্থায় সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে চারমাস জেলবন্দী ছিলেন, পরে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য হন এবং 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামে লেখালিখি চালিয়ে যান। যুদ্ধের বাজারে চাকরি করতে এসেও অফিস থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এহেন স্বভাবের মানুষটির লেখা যে প্রচলনের বাঁধা পথ ধরে চলবে না তাতে আর সন্দেহ কি! জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর গল্পকার জীবন শুরু করেন মোপাঁসার একটি ছোটগল্প 'জার্নালিস্ট' অনুবাদ করে। 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী' প্রকাশিত হবার পর তিনি বৃহত্তর পাঠক সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর গল্পের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি, উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ—বিশেষত 'সূর্যমুখী', 'মীরার দুপুর' 'বারো ঘর এক উঠোন' 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসগুলি একসময়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু জীবৎকালে সে অর্থে পাঠক সমাদর পাননি। বিমল মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিক ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। তবু কোনো বিশেষ মতবাদ কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল না। যদিও আনন্দবাজারে তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশ অতিবাহিত হয়েছে। চারের দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু যে সময় ধরে তিনি লিখেছেন, রাজনৈতিক বিভিন্ন আন্দোলন আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সংকটে সেই সময় নানাভাবে বিপর্যস্ত। অথচ 'বিকালের খেলা' কিংবা 'হিমির সাইকেল শেখা'র মতো গল্প ছাড়া খুব বেশি লেখায় সমকালীন ধ্বস্ত শূন্যগর্ভ রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিঘাত নেই। 'ইষ্টিকুটুম' কিংবা 'বাদামতলা প্রতিভা'র মতো গল্পে সামাজিক বিনষ্টির প্রলম্বিত প্রচ্ছায়া। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনায় যেখানে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার বাস্তব চিত্র, বিক্ষোভ প্রতিবাদ মতাদর্শ; জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায় সেখানে অব্যর্থ ব্যঙ্গ। সময়ের অবক্ষয়কে তিনি ধরেছেন অনেক ভিতর থেকে—মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির যে কেবল স্পষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই তা নয়, শুধু যে তারা বিকারগ্রস্ত তারই ছবি সমুদ্র, গিরগিটি, বন্ধুপত্নী, শ্বাপদ কিংবা পতঙ্গর-র মতো গল্প। চারপাশের এই নাগরিক বৈকল্য থেকে মুক্তির সন্ধানেই কি বারবার ছুটে গিয়েছিলেন প্রকৃতির আশ্রয়ে?'বনের রাজা' কিংবা 'গাছ' গল্পটির কথা এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি। মনে হয়, যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা আর রাজনৈতিক চাপান উতোরে চারের দশক থেকেই যে অস্থিরতা আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল একধরনের আত্মমগ্ন একাকিত্বপ্রিয়তা। এই নৈঃসঙ্গ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা আর অনুভূতির তীব্রতা মননশীল মানুষের নিভৃত চেতনালোকে যে ভাবনার ক্ষরণ ঘটিয়েছে তা-ই ধরা পড়েছে এইসব রচনায়—কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রমুখের নামও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে এখানে উচ্চারিত হতে পারে। বস্তুত, 'প্রকৃতি' শব্দের যে ত্রিমাত্রিকতা—নিসর্গ নারী এবং স্বভাব, বিশেষত নির্মম স্বভাব জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রিয়চেতনা প্রকৃতি ব্যবহারে অভিনবত্ব এবং তার সঙ্গে মানুষের যৌন চেতনাকে প্রবলভাবে সংসক্ত করে তিনি বাংলা গল্পের ধারায় এক স্বতন্ত্র স্বাদ আনলেন। শুধু বিষয়গত নতুনত্ব নয়, তাঁর গদ্যশৈলী তাঁর নিরাসক্ত দৃষ্টি আর তাঁর রচনার অভ্যন্তরে প্রবাহিত এক কাব্যময়তা এক অ-নাটকীয় উপস্থাপনায় জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের শরীরও নতুনভাবে সঞ্জীবিত হল। অথচ জীবিতকালে তাঁর কোনো বইয়ের দ্বিতীয়বার সংস্করণ হয়নি, একটি মাত্র পুরস্কার পেয়েছেন—আনন্দবাজার পত্রিকার 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার'। তবু নিজস্বতা থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি তাঁর, বরং বলেছিলেন— 'কোনো শিল্পীই কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম ও গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকতে

পারে না।...স্বাধীনতা তার জরুরি। কোনো আরোপিত নিয়মশৃঙ্খলা বা বাধ্যবাধকতা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।' এই আপসহীন বেপরোয়া একাকী আত্মমগ্ন শিল্পীর মৃত্যু হয় ১৯৮২ সালের ১ আগস্ট। জগদীশ গুপ্ত কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রের অগ্রজ হতে পারেন, জ্যোতিরিন্দ্র জীবনানন্দের সমমর্মী সহযাত্রী হতে পারেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য এখনো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাধক উত্তরসূরীর অভাবে ক্লিষ্ট।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যেসময় লিখতে শুরু করেছেন, যে সময়ের পরিসরে তিনি লিখেছেন, আগেই বলা হয়েছে, তা খুব সুখের খুব স্বস্তির সময় ছিল না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ফাঁপা মানুষেরা ঘোরাফেরা করছে তখন চারিদিকে; প্রেমে তারা বিশ্বাসহীন, প্রতারণা তাদের মূলধন, সুবিধাভোগের জন্য অনায়াসে তারা হয়ে উঠতে পারে সহোদরের ঘাতক— তখন সৃষ্টির মূল কথা দ্বেষ। চারপাশ জুড়ে তখন অবিরত এক ভাঙনের শব্দ— মানুষের সঙ্গে মানুষের এক তীব্র অনন্বয়। 'মানুষের লালসার শেষ নেই', 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই'। মধ্যবিত্তের চাকরি নেই কিংবা থাকলেও তা অনিশ্চিত, নিম্নবিত্ত বাধ্য হচ্ছে যে কোনো বৃত্তি নিতে, যে কোনো সুযোগ নিতে, সার্বিক এক বিশৃঙ্খলা আর বৈষম্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তখন তাঁর নাভিশ্বাস। এই দগ্ধ আতুর সময়ে লিখতে শুরু করে জ্যোতিরিন্দ্র অতীত চারণায় কিংবা আঞ্চলিকতায় মগ্ন না হয়ে অবলম্বন করলেন চারপাশের এই মানুষজনকে। মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, উত্তেজনা কিংবা অবসাদ পাপ আর পুণ্যের নিরন্তর টানাপোড়েনে বোনা হয়েছে তাঁর গল্পের শরীর। দৃশ্যমান বহির্জগতের অন্তরালে মানুষের অবচেতনের গোপন রহস্য তিনি অব্যর্থভাবে উন্মোচন করেছেন এবং মানুষের প্রেম প্রেমহীনতা এবং যৌনতার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে প্রকৃতি জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে। আর মানুষের নিষ্ঠুর স্বভাব প্রায়শ তাঁর গল্পের চরিত্রকে নিয়ে গেছে আত্মহত্যার দিকে অথবা কখনো সে নিজেই হয়ে উঠেছে হত্যাকারী। নির্মম নির্লিপ্ত সময়ের রক্তাক্ত পদচিহ্ন এইভাবে মুদ্রিত হয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর নিসর্গের ব্যবহারেও জ্যোতিরিন্দ্রের স্বতন্ত্রতা লক্ষ করার বিষয়। জ্যোতিরিন্দ্রের 'শালিক কি চড়ুই', 'বৃষ্টির পরে', 'মঙ্গলগ্রহ', 'বন্ধুপত্নী', 'পতঙ্গ' ইত্যাদি গল্পে ধরা আছে সমকালীন সমাজের বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের বিনষ্টির ছবি। পদ্মপুকুর রোডের মেয়ে গরিব কেরানির বউ হয়ে এলেও তার দ্বিপ্রাহরিক বিলাসিতা ত্যাগ করতে পারে না। অনেক গুজব শুনেও যে স্বামী কল্পনা করত তার নিষ্পাপ মিষ্টভাষী সরল স্ত্রী সারাটা দুপুর একা শুধু চৌবাচ্চার ধারে নর্দমার উচ্ছিষ্ট ভাত খুঁটে খেতে আসা চড়ুইয়ের সঙ্গে খেলা করে কাটায়, সে-ই একদিন হঠাৎ ভরদুপুরে বাড়ি ফিরে দেখে দরজার কাছে একটা দামি ঝকঝকে সাইকেল, তাকে আরো অবাক করে দিয়ে তারই ঘর থেকে বেরিয়ে এল পদ্মপুকুরের পল্লব সেন, সাইকেলে উঠে তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল সে। কেরানিপাড়ায় একরকম গিলে -করা আদ্দি-চিকন দাঁত-পাড় কাপড়, সাদা ক্লোমের জুতো পায়ে দিব্যকান্তি সুদর্শন ছেলে চোখেই পড়ে না। কেরানিটি দেখে, 'চড়ুই আজ আসেনি, একটি শালিক চুপটি করে বসে আছে নর্দমার ওপারে পাঁচিলের ওপর।' এক অসহায় তিক্ততায় জ্বলতে জ্বলতে তার জুতোর ফিতে খুলতে বসা 'পতিব্রতা' স্ত্রীকে কেরানিটি বলে অল্প হেসে—'কি জানি কাল আবার কী আসে, শালিক না চড়ুই।' 'পতঙ্গ' গল্পে যেমন, অধ্যাপকের রূপবতী তরুণী স্ত্রীর মধ্যাহ্ন যাপনের সঙ্গী হয় নিশীথ কিংবা পলাশের মতো ছাত্ররা। রূপার শরীরী বাসনার তীব্র আকর্ষণে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হয় পলাশ এক দুপুরে, আর সেই বিকেলেই নিশীথকে রূপার স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে পাউরুটি কাটা ছুরি দিয়ে রূপাকে হত্যা করে সে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞাসু অধ্যাপক চক্রবর্তীকে অনায়াসে বলে, 'বৌদি মুর্গী খাবে, একটা মুর্গী কেটে দিয়ে এলাম'। 'বন্ধুপত্নী' কিংবা 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পেও দেখি সাংসারিক কিছু সচ্ছলতা আর সাশ্রয়ের জন্য স্বামী তার বন্ধুকে পেয়িং গেস্ট রাখছে আর বৃষ্টিস্নাত রাত্রে 'পতিব্রতা 'সুখী' স্ত্রী অরুণা এসে দাঁড়ায় সুধাংশুর জানালায়, তখন তার 'গায়ের ব্লাউজ ছিল না', আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায় বন্ধুপত্নী, গল্পকথক বলে 'সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যূনতম চেষ্টা করে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে...' 'মঙ্গলগ্রহ'তে বাতে পঙ্গু স্ত্রীর স্বামী, সোমত্ত দুই মেয়ের বাবা কুলদারঞ্জন পাইন, 'পার্কার অ্যান্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়ার গ্রেড ক্লার্ক' 'অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধিব্যাধি থেকে অকস্মাৎ মুক্তি পেয়ে দেখল, 'আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।' পাশের ঘরে নবাগতা ভাড়াটে দম্পতির ঘরের লাল আলোটি যেন তাকে এতদিনের পরিচিত সংসারের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। ইঞ্জিনিয়ারের বউ লীলাদি প্রীতি-বীথির জন্য দেয় ব্লাউজপিস শাড়ি, কুলদারঞ্জনকে দিয়ে আনিয়ে নেয় কচি পাঁঠার মাংস (পাঠক স্মরণ করতে পারেন লীলার রান্না করা একবাটি মাংস চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে একাই সাবাড় করে লোভী কেরানি কুলদারঞ্জনের মুখ, টাই-স্যুট পরা তালপাতার সেপাই ইঞ্জিনিয়ার অনুরোধই করে— 'দয়া করে একটা রিকশা ডেকে দিন না।' আর সত্যিই তো এক জায়গায় থাকতে গেলে এইটুকু উপকার করতেই হয়। ফলে কচি পাঁঠার মাংসের পরদিন অনুরোধ এল 'গঙ্গার ইলিশে'র। সন্ধ্যায় অন্ধকারে মেয়েদের চোখ বাঁচিয়ে লীলার ঘরে ইলিশ পৌঁছতে আসে কেরানিবাবু। লীলার কথায় অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে 'নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে' টাটকা ইলিশের রক্তের দাগ 'শঙ্খিনী' নারীর গাল থেকে মুছে দেওয়া মাত্র ঘর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনিয়ারের গলা— ''ততক্ষণে উনুনের কাঠ কখানা তো কাটিয়ে নিতে পারো ওকে দিয়ে।' শুধু কাঠ কাটা কেন, এক বাড়িতে থাকার সুবাদে নীচ থেকে একটিন সিগারেটও কুলদাবাবুকে দিয়ে লীলাময়ী আনিয়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু এ শুধু কেরানির জীবনের বদ্ধতার বিপরীতে লাল মঙ্গল গ্রহের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে বিহ্বলতার গল্প নয়, স্বামী ও স্ত্রীর স্বভাবকে সমর্থন করে নিজের আলস্যের সময়টাকে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতরের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এইভাবেই লক্ষ করতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পে বালিগঞ্জের মেয়ে রুবি তাই অভিজাত বন্ধুর চেয়ে গণেশের জান্তব পৌরুষেই আকৃষ্ট হয় বেশি, হারিয়েও যায়। 'শ্বাপদ' গল্পে আতা-লিচু-কামরাঙার বনের মধ্যে বান্ধবী রুবির আকস্মিক নিরুদ্দিষ্ট হওয়া গল্পটিকে নানা মাত্রা দিয়েছে—

> ''আতাজঙ্গলের দিকে যাব কি, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, ততক্ষণে, সাপের হিসহিস শব্দের মতন একটা শব্দ ভেসে আসছিল এদিক থেকে। তাছাড়া আতা পাকতে আরম্ভ করেনি যে ওরা ওখানে যাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম ওরা সেখানে নেই; কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হত। ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি।... যাকে বুনো বলতাম, গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানে একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সে অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।''

সময়ের এই ক্ষতচিহ্ন প্রলম্বিত হয়েছিল 'বৃষ্টির পরে' গল্পটিতেও। প্রকৃতি ব্যবহারে এখানে যতই মুন্সিয়ানা থাকুক না কেন, একদা উচ্ছৃঙ্খল দুই বন্ধুর সন্তানেরাও যে বহন করে সেই নষ্ট ভ্রষ্ট সমাজের ভার — অবিবাহজনিত জাত সন্তানের মৃতদেহ বাগানের কোণে পুঁতে দিয়ে দুজনের পলায়নের মধ্যে সেই বেপথু সময়ের চিত্র রয়েছে। 'গিরগিটি ও কি একদিক থেকে অভ্যস্ত দাম্পত্য থেকে নিষ্ক্রমনের বাইরে শুকনো মড়া কাঠ অথচ ভিতরে রসের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা পিপাসু ভুবন সরকারের কাছে মায়ার শরীরীবাসনার আরেক প্রকাশের গল্প নয়?

বস্তুত মায়ার আত্মরতি যৌনকামনা 'গিরগিটি' গল্পে অপূর্ব নিসর্গপ্রতিমা আশ্রয় করেছে। আত্মরূপমুগ্ধ মায়া নিজেকে বারবার দেখে, কখনো ঘরের আয়নায় কখনো জলের আয়নায়। স্বামী প্রণবের সঙ্গে অভ্যস্ত শারীরীক্রিড়ায় মায়া এখন কিছুটা ক্লান্ত, বিরক্তও বটে। তাই নিসর্গকে উৎসর্গ করে তার নগ্ন স্নান দৃশ্য। সেদিন আরও একজন দেখল—ওধারের খুপরির ভাড়াটে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বুড়ো ভুবন সরকার। মায়ার মনেই হয় না লোকটা একজন মানুষ, একজন পুরুষ। 'পাঁকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে কখানা পাঁজর, শনের

মতো পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ'-এর নিষ্প্রাণ চাউনিতে লোকটাকে মনে হয় কখনো ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাঙা পাঁচিল অথবা মৃত নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার মতো। কুয়োতলায় জল নিতে এসেছিল লোকটা, পরে আসতে বলল মায়া। তার নগ্ন নির্জন ধারাস্নান সেদিন কোথায় যেন ব্যহত হল ভাবল ও মানুষটাকে এখানে দাঁড়াতে নিষেধ করা আর ডুমুরের মড়া ডালটাকে এদিকে উঁকি মারতে বারণ করা এক কথা।' কিন্তু ঐ ভুবন সরকার কি সত্যিই মৃত মাদার বা ডুমুরের মরা ডাল? তাহলে সে-ই কেন বা বারবার উচ্চারণ করবে প্রকৃতি-উজ্জীবিত প্রতিমা? মায়া কি তার শুষ্ক শ্রীহীনতায় সঞ্চার করল না নবীন যৌবন? বা তারও জেগে উঠল না রসের পিপাসা? বুড়োর কথায় মায়া যেন এক ডালিম চারা—

> ''চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ে সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল। আঙুল ছেয়ে, নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলমিলি, হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুল বিলি কাটছে আর খিল খিল হাসছে।...একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দুবার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চার্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিল খিল হাসল। ছোট্ট একটি নিশ্বাস পড়ল মায়ার।''

দুপুরে আরশির সামনে আশিরনখ অনাবৃত নিজেকে দেখল মায়া, 'না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে। ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাবণ্য।' ক্রমশ শিহরণে ক্রমশ মায়ার পৃথিবীর এযাবৎ চেহারা বদলে যেতে থাকে। ক্রমশ স্বামীকে তার 'কুৎসিত' মনে হয়। আর ক্রমশ মৃত মাদারের মধ্যে জাগে চাঞ্চল্য। মায়াকে সে কখনো বলে, দিদির থুতনি যেন 'মচ্‌কা ফুল —না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে, অবিকল সে রকম।' কিংবা দিদির ছুটে যাওয়া যে 'রাজহংসীর গতিভঙ্গি'। কখনো বলে, লাল দোপাটি 'দিদির বেণীতে মানাবে ভাল'। ভুবন সরকারের এই রূপবন্দনার পাশে ক্রমশ ম্লান হয়ে যায় প্রণবের অফিসের গল্প — কোন্ ভদ্রলোক বাড়ির ঝি-র সঙ্গে পালালো, কোন্ লোক অফিসের টাইপিস্ট মেয়ে দেখে ভুলেছে — এসব অত্যন্ত তুচ্ছ রুচিগর্হিত মনে হয় মায়ার কাছে। সে চিৎকার করে বলে ওঠে— 'হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এ আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতা, শালিক, বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।' ভুবন সরকার তাহলে মানুষ নয়, পুরুষ নয়! তবে মায়া না শারীর বিভঙ্গে তাকে প্রলুব্ধ করে কেন?। কেনই বা মাঝরাতে নিদ্রিত স্বামীর পাশ থেকে উঠে গিয়ে ভুবনকে বলে মায়া, 'এই জংলা ছিটের শায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো, কেমন দেখাচ্ছে?' ভুবন যদি মানুষ কিংবা পুরুষ নাই হয় তাহলে তার 'হলুদ ফ্যাকাশে চোখ' -ও কি করে খুঁজে পেল মায়ার চোখে 'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজেছে' -এর প্রতিমান? তিনবার বিবাহ এবং চতুর্থবার বিবাহের আগ্রহে আরো একটু এগিয়ে এসে ভুবন যখন বলে, 'পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই,', কিংবা 'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।' —তখন তো ভুবনের কথায় কোনো নিসর্গ - প্রতিমা উচ্চারিত হল না। এ তো সরাসরি দেহজ কামনার প্রকাশ। মায়া যেন এই প্রথম ভয় পেল, কান্নাও পেল তার। কিন্তু মৃত মাদারকে কি কেউ ভয় পায়? ডুমুরের মরা ডাল থেকে কি কারো কান্না পায়? আর মায়া তো অবলীলায় নিজের উষ্ণকোমল হাতটা ঐ মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে হাসল। পুরুষ জাতের ওপর 'ঘেন্না'র এই তাহলে নমুনা? স্বামীর সঙ্গে আভ্যাসিক সম্পর্কের শরীর সম্ভোগের আত্মমুগ্ধতাই মায়াকে কি প্ররোচিত করল না অন্য এক গোপন সম্পর্কের অভিমুখে? মায়ার যৌনবাসনাকে প্রকৃতিপটে এখানে অন্যতর মাত্রা দিয়েছেন লেখক। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ থাকলে দেখা যেতে পারতো কীভাবে চরিত্রের সংগুপ্ত কামনার অথ্যর্থ উপমা হয়ে উঠেছে লাল ফড়িং কিংবা গিরগিটি।

'সমুদ্র' গল্পেও কথকের বিচিত্র মানস - তরঙ্গ বারবার ভেঙে দিয়েছে প্রবল সমুদ্র - সম্ভব সব প্রতিমা। নিহিত এক হিংস্রতায় এখানে একসময় এক হয়ে গেছে সমুদ্র এবং মানবপ্রকৃতি। সমুদ্র সম্বন্ধে এক বোধের জাগরণ, সমুদ্রকে এখানে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার। সমুদ্রে অবিরাম ঢেউ ওঠা - পড়া শব্দে গল্প - কথকের মনে হয়েছে ভেঙে গড়ে পৃথিবীটাকে যেন কেউ নতুন করে তৈরি করে দিচ্ছে। এই সময়েই বিনিদ্র রাত্রিযাপন করতে গিয়ে নিজেকে তার মনে হয় 'বড়— অনেক বড়', আর সমুদ্রের এত কাছে থেকেও যে হেনা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে তাকে মনে হয় 'ছোট— অনেক ছোট।' স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে গড়ে উঠল একটা দূরত্ব, আর বীরেনবাবুর মামার সঙ্গে গড়ে উঠল একটা মানসিক নৈকট্য। পুরীতে ভাগ্নে বীরেনের হোটেলে যাত্রী জোগাড় করে দেয় যে 'মামা', এলাকার মানুষজনের কথায় সে 'বাজে লোক', চেহারায় চরিত্রেও কিন্তু গল্প - বক্তার কাছে এই লোকটা যেন 'গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, কবি বা দার্শনিক।' লোকটা কুড়ি বছর ঘুমোয়নি, রাত জেগে ঢেউয়ের গর্জন শুনেছে আর সেই সমুদ্রের স্বাদ কথকের স্নায়ুশোণিতে সঞ্চার করতে করতে বলে, 'আপনার রক্তের মধ্যে ওই শব্দ চলে যাবে— মগজের ভিতর ছবিটা আটকা পড়বে— আজ না, কদিন তাকিয়ে থাকুন— তখন আর কোনো কাজকর্ম ভালো লাগবে না, চোখের ঘুম উধাও হবে। ক্ষুধা কমে যাবে' —বাস্তবিক এই 'ভয়ঙ্কর' নেশার সংক্রামে কথক তার স্ত্রীকেও মনে হয় যেন জুঁইফুলের ওপর মাছি, তাকে অনাবশ্যক আঘাত করে উল্লাসিত হয় সে। এই অদ্ভুত লোকটাই গল্পকথককে শেখায় যে সমুদ্র 'পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না— সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।' সমুদ্রের ঢেউগুলো কি সত্যিই জুঁইফুল না 'সাদা শক্ত ধারানো দাঁত।' সমুদ্রকে ধান দুর্বা বেলপাতা কচি ডাব উৎসর্গ করে কী লাভ? সমুদ্র তো ওগুলো খায় না, ফিরিয়ে দিয়ে যায় বেলাভূমিতে। তাই সেই মামা যখনই সমুদ্র - সন্নিধানে আসে পকেটে করে নিয়ে আসে মাছভাজা পাঁউরুটি কেক কিংবা ডিমের বড়া। বলে 'ওই আমার নেশা— সমুদ্রকে খাওয়ানো। আলোচনার পরিসরের স্বল্পতা না থাকলে হয়তো বিশ্লেষণ করা যেতো প্রযুক্ত শব্দ জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে কীভাবে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। 'সমুদ্রকে খাওয়ানোর এই নেশাতেই কি বীরেনের আদরের অ্যালসেসিয়ানকে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছে মামা— সকলের তো তাই সন্দেহ।

কথকের মনে হল, ঐ লোকটা তার মধ্যে 'একটা কিছু' সংক্রামিত করে দিতে পেরেছে। সারারাত্রি জেগে সে যত না শুনল শব্দের ঝড়, যত না দেখল 'লোভী নিষ্ঠুর অতৃপ্ত অশান্তে ঢেউয়ের দাঁতালো ভয়ঙ্কর চেহারা', তার চেয়ে বেশি দেখল 'কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা নরম তুলতুলে শরীর'। এতদিন ধরে ঝামাপুকুরের বাড়ির অভ্যস্ত দাম্পত্যে যে হেনাকে মনে হত 'ঘুমন্ত খরগোশ', যার দেহ - সমুদ্রে নিজেকে ছেনে দিয়ে তৃপ্ত ছিল সে, আজ সমুদ্র তার সেই অতীতকে যেন তুচ্ছ করে দিল। জানলার বাইরে তার ক্ষুধার্ত আর্তনাদ কথককে অস্থির করে তুলল—'অন্ধকার সমুদ্র গোঁ গোঁ করছিল। আমার মাথায় তখন একটা কুকুরছানা, নরম মাংস।' পরদিন ধূসর বিষণ্ণ আকাশ আর ছাই রং জলরাশিতে সমুদ্রকে আরো ভয়ঙ্কর লাগছিল। ক্রমশ গল্পকথকের মনে হচ্ছিল এবার সমুদ্রকে তার 'বোরিং' মনে হবে। আবার বদলে গেল প্রকৃতির চেহারা— জ্যোতিরিন্দ্রের গদ্য এখানে তাঁর কবিপ্রাণের স্পর্শে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

''একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড়হয়ে আছে মাথার ওপর, সমুদ্রের ওপর, আর সেই পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা

রঙের রৌদ্র। আর সেই রোদ শুষে নিতে লুঠ করে নিতে ঢেউদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, তারা কলরব করছে, ছুটছে, ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে রূপার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল; যেন দিগন্ত ছুয়ে আছে বলে নীল পেয়ালা থেকে চুঁইয়ে পড়া সবটুকু আলো শুষে নিতে পেরে ওধারের জল শান্ত গম্ভীর হয়ে আছে।"

এই পাশ্চাৎপটে কথক দেখল 'কেবল একজন— একটি মূর্তি —ফেনার দুধে পা ডুবিয়ে খিল খিল করে হাসছে হেনা, 'আর কেউ নেই, আর কিছু চোখে পড়ল না।' তখন তার মনে হল 'সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির মতো বিশাল বালুবেলার এই নগ্ন নির্জন উজ্জ্বল আলোর উৎসবেও তার মনের মধ্যে জেগে উঠল তীব্র এক হননস্পৃহা। হাস্যময়ী, লাস্যময়ী হেনাকে সে জীবনের তীর থেকে ছুঁড়ে দিতে চাইল মৃত্যুর কিনারায়। ভীত স্ত্রীকে অভয় দিয়ে তার হাত ধরে সে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে হেনাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে আঁকশির মতো বাঁকানো শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে সে ওর গ্রীবার নরম মসৃণ মাংস অনুভব করছিল। আর তারপর সামনে শুধু ধূ ধূ সমুদ্র ছাড়া আর কিছু রইল না। 'সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে ঢেউ, পিছনে আর একটা, আর একটা...'

হেনা চিৎকার করে ওঠে ভয়ে, স্বামীকে একবার দেখে তারপর সৈকতভূমির দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে— 'যা ভেবেছি তাই, ওই তো শয়তানটা দাঁড়িয়ে হাসতে —ওর পরামর্শ শুনে তুমি এমন কাজ করতে চাইছ'— কথক দেখে, বীরেনবাবুর মামা হাতে একতাল কাঁকড়ার মতো কি যেন ঝুলিয়ে নিয়ে ওদের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যাতেই পুরী ছাড়ল তারা, কিছুদূর এসে যেন সহজ স্বাভাবিক হতে পারল গল্পকথক। হেনার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি আমায় বলতে পারতে, জানিয়ে দিতে পারতে লোকটা এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর— স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল।' হেনা বলল, 'বলিনি— বলতে ভয় করছিল— কি জানি যদি ওর রোগের ছোঁয়াচ তোমাকে পেয়ে বলে—সমুদ্র দেখে এমন পাগল হয়ে উঠেছিলে!'

কি সেই সংক্রমণ? শুধুই সমুদ্র - গ্রস্ত মামার সান্নিধ্য? নাকি সীতা - উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের সমুদ্র - শাসনের প্রতিশোধ? কিন্তু পুরীতে প্রথম রাত্রির সমুদ্র - সংসর্গেই তো 'কুকুরের মতো কুণ্ডলী' পাকিয়ে ঘুমন্ত হেনাকে দেখে ঘৃণা হয়েছিল তার। তাহলে কি আভ্যাসিক দাম্পত্যের ভিতরে জমে থাকা ক্লেদ টেনে বের করে আনল সমুদ্র? বলা বাহুল্য, গড়পড়তা সমুদ্র - সন্দর্শনের অভিজ্ঞতা এ গল্পের বিষয় নয়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'প্রকৃতি সবার ধাতে সয় না' (সবুজ মানুষের জন্ম - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প, তপোব্রত ঘোষ, ভাঙা কাচের শিল্প, ১৯৯৪), তাই বিরাটের কাছ থেকে, ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের স্বাভাবিকতা থেকে ঝামাপুকুরের ঘেরাটোপের নিশ্চিন্ততায় ফিরে গিয়ে স্বস্তি পাবে তারা। কিন্তু সত্যিই কি পাবে? হেনা কি ভুলে যেতে পারবে তার স্বামীর এই অস্বাভাবিকতা? হেনার দেহ-সমুদ্রে অবগাহনকালে কথকের মনেও যদি কখনো আবার ঝলসে ওঠে রাক্ষুসে সমুদ্রের ছবি? বলা বাহুল্য, গল্পটি বহুমাত্রিক। নিসর্গ যে শুধু মানুষের ভিতরের অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাকে কখনো এমন উন্মোচিত করে তাই নয়, নিসর্গ কখনো ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট দীন জীবনযাপনের সব গ্লানি সব ক্ষতি। দুর্ঘটনায় পঙ্গু কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার বছর সাতাশের যুবকের এমনি এক প্রকৃতি মুগ্ধতার গল্প 'সামনে চামেলি'। অভাবগ্রস্ত প্রাত্যহিকের ক্লান্তি ভুলে যায় যে সুন্দর রাস্তা, সুন্দর বাড়ি, গাছপালা ফুল পাখি দেখে— সুন্দরের জন্য এই পিপাসাই তাকে ভবিষ্যতে সুন্দর শ্রীময় এক জীবনের যাপনের প্রতি উন্মুখ করে রাখে। এই স্বপ্নই স্কুল ছুটির শেষে তার ক্ষুধার্ত শরীরটাকে এই সুন্দর নির্জন অভিজাত রাস্তায়, ঐসব হেনা, বেল কিংবা বকুল চাঁপায় ভরা ব্যালকনি দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় সে। তারপর রাধাচূড়ার পরের গাছটা যখন মে- ফ্লাওয়ারের বদলে হল ইউক্যালিপটাস তখন ওপরে চেয়ে সে দেখল অপরূপ ব্যালকনি। জুঁই নয়, মাধবীলতা আর সেই মাধবীলতার মাঝখানে এক রূপময়ী - দীর্ঘাঙ্গী সে-ই যুবতী এতটাই ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে যে তার সুন্দর শাড়ির আঁচল যেন তার মাথা ছোঁবে। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। চোখ নামিয়ে হাতের আঙুল দেখতে লাগল সে। তারপর আবার শব্দ শুরু হল — গাছের পাতার মর্মর, প্রেসার কুকারের হিসহিস, কুকুরের ডাক। আর ঠিক তখনই তার কানে এল কেউ যেন কিছু পয়সা—ধাতব মুদ্রা ছুঁড়ে দিল ফুটপাতে। যুবকটি ভাবল, তাহলে সে নিশ্চয়ই এখানে একা নেই, এক-আধজন ভিখারি হয়তো কোনো গাছতলায় বসে আছে। উপরে চেয়ে দেখল বারান্দা থেকে যুবতী আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আরো সামনে এগিয়ে যেতে চাইল সে - হয়তো সামনে রয়েছে আরো সুন্দর কেউ। কিন্তু এগোবার আগেই ঐ বাড়ির চাকর তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি পয়সা ছুঁড়ে দিল তুমি নিলে না, চলে যাচ্ছো!' 'ওই দ্যাখো দিদিমণি আবার এসে দাঁড়িয়েছে— জিজ্ঞেস করছিল যদি পয়সা না নাও পুরোনো শার্ট পাঞ্জাবি আছে, নেবে কি?' সে হেসে মাথা নাড়লো, এগিয়ে যেতে লাগল সামনে, ক্রাচে ভর করে, যেন সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে, তার সুগন্ধ তাকে টানছে। রূপমুগ্ধ যুবক সুন্দরী রমণীর ভিক্ষাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার সব আর্থিক দীনতা সত্ত্বেও। এ যেন অর্থলুব্ধ অহঙ্কারী নাগরিকের বিরুদ্ধে প্রকৃতিমুগ্ধ সৌন্দর্যমুগ্ধ লেখকেরও এক প্রচ্ছন্ন অভিমান, তীব্র বিদ্রূপ। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের চরিত্ররা প্রায়শ নিসর্গের মধ্যেই খুঁজে নেয় তাদের বেঁচে থাকার রসদ। তাই পোস্ট অফিসের কেরানি গতানুগতিকতার বাইরে নিজের মতো করেই বাঁচতে চায়, কোনো ঘোষিত প্রতিবাদ ব্যতিরেকেই। তাই নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই মাঝপথে নেমে পড়ে সে— নাগরিক আকাশের মেঘদূতের আনাগোনায় অস্থির হয়েই যেন। অনেকক্ষণ ময়দানে প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ভিজলেন ছিপছিপ বৃষ্টিতে। তারপর গাছের কাছে ছুটলেন। গাছতলায় ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টির অন্যরকম স্পর্শ। কৃষ্ণচূড়ার নীচে বৃষ্টিতে ভেজার এক অনুভূতি, আবার দেবদারুর নীচে আরেকরকম। একটা গাছ ছেড়ে অন্য গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ান আর এক-একরকম স্বাদ সর্বাঙ্গে অনুভব করেন বৃষ্টির। ভিজতে ভিজতে শেষে ঘন পাতাওয়ালা একটা বাদাম গাছের মস্ত ছাতার তলায় এসে তিনি অবাক হয়ে যান। এখানেও জল পড়ছিল, তবে তা' টুপটাপ, যেন পাখির চোখ চুঁইয়ে এক-ফোঁটা, দু-ফোঁটা। সে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। তার ভেজা ট্রাউজারে অতসী ফুলের রং, গায়ে ভেজা কুর্তার অপরাজিতার নীল। মাথার চুল দিয়ে ঝরছে টাপুস টুপুস জল, বৃষ্টির জল থমকে গেছে তার চোখের পাতার। তারপর সেই মেয়ের সঙ্গে শুরু হল এই কেরানির কথোপকথন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে কয়েকটি মুহূর্ত একান্ত নিজস্ব করে উপভোগ, পোস্টঅফিসের কেরানির জীবনে এই যেন একটি বিস্ময় - ভ্রমণ, এসব নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের 'তাঁকে নিয়ে গল্প', কিংবা এ গল্পের শেষে পাঠকও বৃষ্টিস্নাত পৃথিবীর পথে স্বপ্নাভিসারে বেরিয়ে পড়ে যেন। এ গল্প রীতি মেনে কোনো নিটোল বৃত্ত সম্পূর্ণ করে না, কিন্তু তাতে কোনো আক্ষেপ নেই। ''ময়দানের কাছে বর্ষার গাছতলায় এমন সুন্দর একটা বিকেল, বিশেষ করে তাঁর ছুটির দিন, মানুষটাকে চুপি চুপি উপভোগ করতে দিতে ক্ষতি কি, মনে মনে আমরাও কি এক বিকেলে এমন চমৎকার কোনো গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অফুরন্ত ভিজতে চাই না?'' ইঁট - কাঠের এই নীরক্ত নাগরিক কলকাতায় লেখক নির্মাণ করতে চান কবিতার এক কল্পজগৎ যেখানে পৃথিবীর মধ্যে এক অপার্থিব জগতের ঈশারা, 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান।

প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের এই কথাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন তাঁর 'বনের রাজা' গল্পে। 'সমুদ্র' গল্পে সমুদ্র থেকে দূরে গিয়ে স্বস্তি পেয়েছিল কথক, আর 'বনের রাজা'-য় প্রকৃতিকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সারদা চরিত্রটির এক আশ্চর্য প্রশান্তি। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আর মানুষের নিহিত কোনো জিঘাংসার প্রকাশ নয়, নিসর্গের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর মানবিক সারল্যের অপরূপ সমীকরণে গল্পটি বিশিষ্ট। পরিবেশ - দূষণ বর্তমানের একটি বহু-আলোচিত সমস্যা, শহরকে দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে এখন অনেক প্রকল্প; কিন্তু আজ থেকে অনেক বছর আগেই

জ্যোতিরিন্দ্রের দূরদৃষ্টি লক্ষ্য করেছিল নগর কলকাতার এই অসুখ। তাঁর গল্পে তাই দেখি, একসময়ের মস্ত ইঞ্জিনিয়র সারদা তাঁর ষাট বছর বয়সে শহরে এলগিন রোডের মস্ত বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে এসেছেন গ্রামে। সেখানে গাছের 'ডাল-পাতা, ফুল - কুড়ি, ফল সব —সবাই ফিস্‌ফিস্ করে' তাঁর সঙ্গে কথা বলে। শহর থেকে ছুটিতে দাদুর কাছে বেড়াতে এসেছে দশ বছরের মতি, স্বাস্থ্যোদ্ধারের বাসনাও আছে তার, সারদা তাকে বলে, 'বীডন স্ট্রিটের গাছ!...দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা গাড়ির ঘড়ঘড় ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার শুনে সেসব গাছের কিছু আছে নাকি। সব বোবা হয়ে গেছে, কথা বলবে কি, কোনোরকমে প্রাণটা টিকিয়ে রেখে ধুক্‌পুক্ করছে।...শহরের গাছেরা কথা বলে না, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের জিভ খসে পড়েছে, গাড়ির ঘড়ঘড় আর রেডিওর চেঁচামেচি শুনে শুনে তাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।' 'ভেজাল খাদ্য আর বদ্ধ বাতাস' তেমনই ক্ষইয়ে দিচ্ছে শহুরে মানুষের পরমায়ু— গ্রামের খোলা হাওয়া, টাটকা মাছ পুকুরের আর খাঁটি দুধের বিপরীতে নাগরিক 'ব্যালান্সড্ ডায়েট নিয়ে কিছুটা বিদ্রূপই করেছেন লেখক। সারদা গাছের আম - আনারস-জাম-জামরুল-পেয়ারা টপাটপ মুখে ফেলে, আর তার ছেলে সুকুমার 'কাচ ঘেরা বদ্ধ অফিস কামরার পাখার তলায় বসে...পাঁউরুটি, টিনের মাখন, শিয়ালদার ঠান্ডা ঘরে জিইয়ে রাখা দুটো আলু সিদ্ধ, মরিচগুঁড়ো, বাসি ডিম আর কিছু শুকনো আনাজ সিদ্ধ ও গুড়ো দুধ জমিয়ে তৈরি একটা বড় বরফি দিয়ে লাঞ্চ খায়।' 'প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেলস্ সহযোগে' এইসব সুসম খাবার খেয়েও কিন্তু তার 'শরীর কেমন নরম ঢিলেঢালা হয়েগেছে।' আর 'বুড়ো হলে হবে কি, হাতের পায়ের মাংসের গোছার এখনও শক্ত পাথুরে চেহারা' সারদার। এইভাবে নাগরিক কৃত্রিমতা আর দূষণের বিপ্রতীপে বালক মতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের মুখোমুখি হতে থাকে। দাদুকে একবার তার মনে হয় গাছের রাজা, একবার ফলের রাজা। সারদার কথায় রোদের তাপ থেকে বাঁচতে আগেই জামা, প্যান্ট খুলে ' ন্যাংটা হয়ে গেছে মতি, আর একবার যখন পরনের প্যান্ট ঘাসের ওপর রেখে দাদু জলে নামল স্নন করতে, তখন মতি ভাবল—এ আবার কি? দাদু সাঁতার দেয়, মতি দেখে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখে এক পাতাকুড়ানি জীর্ণবসন মেয়ে তার দাদু - সারদার সঙ্গে কথা বলছে। একবার ঐ মেয়েটি আর - একবার স্নানরত দাদুর দিকে তাকিয়ে মতি ভাবে—''তবে কি দাদু, এত বড় মেয়েটার সামনে জল থেকে ডাঙায় উঠবে?' এককালের সেই মস্ত ইঞ্জিনিয়ার দাদুকে তখন মতির মনে হয় 'একটা জন্তু, একটা দানো, একটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত জীবে পরিণত হয়েছে।" কিন্তু না, কোমরজলে দাঁড়িয়েই দাদু লাল শাপলা ডাঙার দিকে ছুড়ে দেয়— মেয়েটা খোঁপায় গোঁজে, আঁজলা জল খায় তারপর বেতঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সারদা এবার জল থেকে ডাঙায় ওঠে, মতি দেখে— 'টপটপ জল ঝরছে কান থেকে, নাকের ডগা থেকে, থুতনি থেকে, হাতের আঙুলগুলি থেকে। দাদুর উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল একটা পুরানো গাছ। অনেকদিন জলের নীচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে।' মানবশরীর আর প্রাচীন বৃক্ষের সমীকরণ ঘটে যায় এখানে। দাদুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে মতি অনুভব করল দাদুর গায়ের গন্ধ যেন 'কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ।' সভ্যতার আদি লগ্নে মানব আর প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্পর্কের ইঙ্গিত যেমন সারদা চরিত্রটির মধ্যে তেমনই তার পোশাক বর্জনে নগ্ন স্নানপর্বে আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় কৃত্রিম নির্মোককেই যেন উপহাস। মতির বালক সত্তার নগর - গ্রামের দ্বৈরথে, সারদার নিসর্গ প্রাণতায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনে সভ্যতর যাবতীয় ব্যাধি নিরাকরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই গল্পে। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখে প্রকৃতিই যেন হতে পারে শুশ্রূষার নিবিড় প্রলেপ - শেষপর্বে 'গাছ' নামক গল্পটির লোকায়ত ভঙ্গিতে লেখক সে কথাই বলেছেন। মানুষের সত্তা পেয়েছে এখানে গাছটি, উপকথার (Fable) ভঙ্গিতে এখানে ভিন্ন স্বাদ।

'একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা সুন্দর কি অসুন্দর কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না।'

ঋতুতে ঋতুতে বছরে বছরে গাছের চেহারা কখনো শ্রীহীন কখনো উজ্জ্বল, কখনো তার 'ডাল খালি', কখনো 'ফুলে যায় ভরে।' তবু গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে। আশেপাশের বাড়ির মানুষগুলো আসে বটে গাছের কাছে। যেমন সকাল হতে প্রৌঢ় আর বৃদ্ধেরা খবরের কাগজ হাতে আসে, গাছতলায় বসে তারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির আলোচনা করে, দুপুরের দিকে এসে পা ছড়িয়ে ঘর - গেরস্থালির গল্প করে এ-বাড়ি ও বাড়ির বৌ-র আর বুড়িরা। বিকেল হলেই ছুটে আসে ছেলেছোকরারা দল।' গাছটাকে ঘিরে হৈ-হল্লা ছুটোছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা পাতা ছেঁড়া, বা কোনোদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোলা খাওয়া।' আবার কখনো এমন সময়ও আসে যখন গাছ স্থির স্তব্ধ। 'পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বা মনে হয় কোনো দার্শনিক। চিন্তাশীল মানুষ যেমন চুপ করে থাকে। সত্যি গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মানুষ বলে কল্পনা করা যায়...'

চিন্তাশীল দার্শনিকের মতো তাহলে গাছরেও কি থাকে অন্তর্দৃষ্টি? কারণ গাছটা যে বুঝতে পারছিল পূর্বদিকের একটা বাড়ির সবুজ জানলায় বসে একজন তাকে দেখে। আগেও দেখত সে অন্যদের মতোই গাছের পাতা ঝরা ফুল ফোটা। এখন তার দৃষ্টিতে যেন একটা সতর্ক সন্ত্রস্ত ভাব। গাছটা বুঝতে পারল একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা পেয়ে বসেছে তাকে। গাছ ভয় পেল, 'দেখল কেবল দিনের আলোয় না রাত্রি গভীর অন্ধকারেও দুটি চোখ জানলায় জেগে আছে।' সে চোখে কাজলের সঙ্গে মিশে গেছে ঘৃণা আর বিদ্বেষও।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। সবুজ জানলার ঐ মানুষটিই বুঝি জানিয়ে দিল সকলকে 'এই গাছ দুষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও।' শিশুরা গাছের নীচে খেলা করে। একটা ডাল ভেঙে পড়তে কতক্ষণ? বজ্রপাত যদি হয় গাছের মাথায়, তবে গাছের নীচে যারা থাকবে তাদের মৃত্যু অবধারিত। কিংবা কেউ যদি মরণবাসনায় আশ্রয় করে গাছকে ডালকে! অর্থাৎ গাছই যেন হাতছানি দিচ্ছে মৃত্যুর, তাই 'ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলসুদ্ধ।' এসব শুনে আশেপাশের মানুষগুলো চঞ্চল হল।

পশ্চিমদিকের আর একটি বাড়ির লাল জানলায় বসে আর একজনও গাছটাকে গভীরভাবে দেখছিল। আর সেদিকে দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উঠল, খুশি হল। কারণ লাল জানলার মানুষের চোখে ভয় আতঙ্ক ঘৃণা দ্বেষ কিছুই নেই, বরং আছে স্নেহ মমতা প্রেম আর সহানুভূতি। গাছ অবাকও হল। এই কদিন আগেও তো মানুষটার দৃষ্টি অশান্ত ছিল। চলায় বলায় ছিল চাঞ্চল্য। কতবার গাছে ডালপালা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়েছে, উঠে এসে ভেঙে দিয়েছে পাখির বাসা। কিন্তু আজ সে মার্জিত ভদ্র স্নিগ্ধ সুন্দর। গাছটাকে যত দেখছে তত ভাবছে, তত তার তৃপ্তি তার আনন্দ। গাছ এবার নিশ্চিত হল।

লাল জানলার মানুষটার কাছে - সবাই শুনল অন্যরকম কথা।

''এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নীচে সকালে বিকালে মানুষগুলি একত্র হয়। একটি মানুষকে আর একটি মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা আর অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাধূলা করতে পারে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিতরণ করছে মাঠের ওই বনস্পতি।"

সবুজ জানলার মানুষের কথা শুনে যারা ক্ষিপ্ত হয়েছিল, এই লাল জানলার মানুষের কথায় তারা আবার নতুন করে ভাবল। সেই লাল জানলার সুন্দর মানুষটি আরো বলল—

''ইঁট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। অমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।''

একথা শুনে ক্ষিপ্ত মানুষগুলো যেন শান্ত হল। গাছ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না। 'গাছের মনে দাঁড়িয়ে রইল।'

পূবের জানলার মানুষটি কিন্তু চুপ করে থাকল না। গাছ শুনল। দাঁতে দাঁত ঘসে সে প্রতিজ্ঞা করছে, আর কেউ যদি তাকে সাহায্য না করে তবে সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে উপড়ে দেবে। পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানে কথাটা যেতেই বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন দেওয়া চলবে না। গাছ আবার ভয় পেল। তাকে নিয়ে কি দুটি মানুষের মধ্যে বিরোধ বাধবে? সেই রাত্রিতে গাছ দেখল পূর্বদিক থেকে সে আসছে। মালাটা খোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। হাতে ধারালো কুঠার। যুদ্ধের ভঙ্গি দেখে গাছ শিউরে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর - একদিকে মানুষের পায়ের শব্দ হল। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে গাছ নিশ্চিন্ত হল। পশ্চিমের জানলার মানুষটি এসে গেছে। তার দৃষ্টি নির্মল। শক্ত চোয়ালে প্রতিরোধের আদল। গাছ কান পেতে রইল।

'হাতে কুড়ুল কেন?'

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ, কী?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতন দেখে সে পাপী।...তার হৃদয়ে হিংসা। তাই...আলো থাকলেও তার চোখে সব কিছু অন্ধকার।'

'তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই? কালো বলতে কিছু নেই?'

'নেই।'

গাছ দেখল একজনের হাত থেকে কুড়ুল খসে পড়ল, আর একজন ফেলে দিল লাঠি।

'সব আলো সব সুন্দর —কিছু কালো নেই কোথাও অন্ধকার নেই এমন কখন হয়?'

''নিজের ভিতর যখন আলো জাগে।''

'সেই আলো কী?'

'প্রেম।'

মেয়েটি কেঁপে উঠল, গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না?' ছেলেটি সুন্দর করে হাসল, 'ভালবাসতে শিখতে হবে।'

'তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

এবার গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। দুশ্চিন্তায় কত বিনিদ্র রাত সে কাটিয়েছে। অথবা যেন সে ইচ্ছে করে আর নীচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও তেমনি কখনো মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছ সে কথা জানে।

এই বিস্তৃত দৃষ্টান্ত সম্ভব আমাদের জানিয়ে দেবে কেন 'আপনি অবক্ষয়ের সার্থক কথাশিল্পী'— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বলা লোথার সুৎসের এই উক্তিই তাঁর সম্পর্কে শেষ এবং সম্পূর্ণ মন্তব্য নয়। তিনি 'একান্তভাবে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তজীবনের অনবরত ভঙ্গুরতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নিবিষ্ট রূপকার', ভূদেব চৌধুরীর এই মন্তব্যের ফ্রেমেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে সীমায়িত করা যাবে না। তাঁর গল্পে মানুষের অবচেতনা নানা বৈকল্য, যৌনবাসনার যতই অস্বাভাবিকতা থাকুক না কেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে শেষ পর্যন্ত এই ভাঙনই বড় কথা নয়। মানব প্রকৃতির আদিম হিংস্রতা তাঁর কাছে সত্য হলেও শেষ সত্য নয় বরং 'মানুষের তরে মানুষীর' অপেক্ষমান হৃদয়ই বড় হয়ে উঠল। শরীরীবাসনার আবর্তে পাক খেতে খেতে ক্লান্ত মানুষ প্রেমের জাগরণে উৎজীবিত হল, প্রেমের আলো জেগে উঠল নতুন সূর্যোদয়ে। নঞর্থক একটি ভঙ্গি থেকে ক্রমশ উত্তরিত হয়েছেন লেখক ইতিবাচক এক বোধে। নিসর্গপটকে জ্যোতিরিন্দ্র যেভাবে ব্যবহার করেছেন, ইন্দ্রিয় চেতনার তীব্রতা তাঁর গল্পে যেভাবে ধরা পড়েছে, যে নির্লিপ্তভঙ্গিতে তিনি উন্মোচন করেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের সব শূন্যতা সব ফাঁকি, তা তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যই চিনিয়ে দিয়েছে। বিচ্ছিন্নতার একটা বোধ, নিরন্তর শোষণ এবং সামাজিক অবিচারে পীড়িত মধ্যবিত্ত সেদিন যে অবসন্ন প্রায় - অলস জীবনযাপন করেছিল, তা-ই তাকে ক্রমশ প্ররোচিত করেছিল দুর্নীতিতে, পাপে, প্রেমহীন যৌনসঙ্গমে— জ্যোতিরিন্দ্র এই কাল-ব্যাধিটাকে সম্যক চিনতে পেরেছিলেন। মানুষের চরিত্রগত নিষ্ঠুরতা কখনো প্রকৃতির আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছিল। সময়ের এই নিপুণ ভাষ্য রচনার জন্য জ্যোতিরিন্দ্র ধন্যবাদার্হ হতে পারেন। উপমা - অলঙ্কার-প্রতীক রচনার তাঁর দক্ষতাও প্রশ্নাতীত। বিষণ্ণতা বিকার এবং আত্মহননের ও হত্যার ইচ্ছা সে সময়ের অধিকাংশ চরিত্রের নিয়ামক। জ্যোতিরিন্দ্র মানুষের এই অ-সুখটাকে অনেক ভিতর থেকে ধরতে পেরেছিলেন এবং অপূর্ব ভাষার আধারে সেই আত্মসংকটকে প্রকাশ করেছিলেন। যদিও প্রাথমিক পর্বে তাঁর রচনায় নিসর্গচেতনার যেরকম প্রকাশ, ইন্দ্রিয় চেতনার যে তীব্রতা তা পরবর্তীকালে কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল, এ ব্যাপারে স্বয়ং লেখকই বলেছিলেন— ''আমি এখন টেকনিকটাকে আরো বেশি ফ্রি করতে চাই, যেন তা আলো বাতাসের মতো চরিত্র এবং পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। খুব সাধারণ খুব সহজ শব্দ যদি এসে যায় আমি ওই শব্দই দেব। পরিস্থিতি শব্দ টেনে আনবে, লেখক কিছু করবে না— লেখকের কিছু করাই নেই। আমার লেখায় তাই আজ উপমা কমেছে। আমি ইচ্ছে করেই কমিয়ে দিয়েছি।'' 'গিরগিটি'র এবং 'গাছ' গল্প দুটি লেখকের এই মানসিকতার যথাযথ এবং অনন্য নিদর্শন। বস্তুত বাংলা ছোটগল্পে নারী- নিসর্গ এবং স্বভাব, প্রকৃতির এই ত্রিমাত্রিক ব্যঞ্জনায়, ছোট গল্পের বিষয় এবং বিন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একটা স্বতন্ত্রতা এনেছিলেন। তবুও গড়পড়তা বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি যে অনেকাংশে অপঠিত রয়ে গেলেন, তার কারণ কি লেখকের দুর্বোধ্যতা না পাঠকের আলস্য!